আমাদের সময়

তারিখ ... 19 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

কল্লোল মোস্তফা

পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকের অমানবিক জীবন

ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হবে অসংখ্য বই– গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ কত কী! এসব বই প্রকাশের পেছনে লেখক-প্রকাশক ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকরা। ছাপা পাণ্ডুলিপি সেলাই করে আঠা লাগিয়ে দুই মলাটের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও নান্দনিক করে সময়মতো পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করেন তারা। শুধু বইমেলাই নয়, সারা বছরই পাঠ্যবই, গাইড বই, সৃজনশীল বই, ডায়েরি ইত্যাদি বাঁধাই করার কাজ করেন তারা। কয়েকদিন আগে সারা দেশে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রায় ৩৪ কোটি পাঠ্যবই বাঁধাইয়ের জন্যও দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তারা। এবারের পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে ফুলের মতো ফুটব, বর্ণমালার গরব নিয়ে আকাশজুড়ে উঠব।' যাদের হাতে বাঁধাই করা বই পড়ে সারা দেশের শিশুরা ফুলের মতো ফুটে উঠবে, যাদের হাতে মলাটবদ্ধ হয় কত স্বপ্ন কল্পনার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, তাদের নিজেদের জীবনটা কেমন?

পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকরা কাজ করেন এরকম একটি কারখানায় গিয়ে দেখা গেল, চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো বই নিয়ে টেবিলের মতো দেখতে একটা কাঠামোর সামনে টুলের ওপর বসা একটি ছোট ছেলে। এই ছেলেটি কিন্তু পড়াশোনা করছে না। যারা পড়াশোনা করবে তাদের জন্য বই বাঁধাইয়ের কাজ করছে। 'বেঞ্চ'টি আসলে একটা গু মেশিন যেটি দিয়ে বইয়ের মলাট লাগানো হয়। আরেকটি ছেলে দেখা গেল হুইল হাতে কী যেন করছে। না, এটি কোন থিমপার্কের খেলনার গাড়ির হুইল নয়, কাটিং মেশিনের হুইল– যা দিয়ে রিম রিম ছাপা কাগজ কাটা হয়। পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করতেই গু মেশিনের সামনে বসা ছেলেটি বলল, 'আমরা যদি পড়াশোনা করি তাইলে বই বানাইব কে?'

পুরান ঢাকার সূত্রাপুর, বাংলাবাজার, আরামবাগসহ বিভিন্ন স্থানে বিল্ডিংয়ের নিচতলায় আলো-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘুপচি ঘর ভাড়া করে গড়ে ২০-২৫ জন শ্রমিক নিয়ে গড়ে ওঠে একেকটি পুস্তক বাঁধাই কারখানা। আট-দশ বছর বয়সে এক একটা ছেলে সেই যে কারখানায় ঢোকে, কারখানা থেকে আর বের হতে পারে না। গোটা যৌবন কাটে ঘুপচি কারখানার ঘেরাটোপে বসে বসে ছাপা কাগজ ভাঁজ করা, কাটা, ইন্টারলিভিং, ম্যাচিং (তাদের ভাষায় 'মিছিল'!), সেলাই আর মলাট লাগানোর কাজে! বয়স হলে যখন আর আগের মতো হাত চলে না, চোখের দৃষ্টি কমে আসে, তখন চলে যেতে হয়। কোথায় যায় কে জানে! একজন প্রাপ্তবয়স্ক দক্ষ শ্রমিকের কাজ শুরু হয় সকাল ৮টায়। কাজ শেষ হয় সেই রাত দশটা-বারোটায়। ৮টা থেকে ৫টা 'এক রোজ'-এর শ্রমমূল্য মাত্র ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা। ৫টা থেকে ১০টা আরেক 'রোজ'। শিশুদের বেলায় কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্তই কাজ করতে হয়, মাসকাবারি মাত্র দুই থেকে তিন হাজার টাকা। কারোরই কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। ছুটি নিলে বেতন মেলে না– তাদের কাজের নিয়ম হলো 'কানামনা' অর্থাৎ কাজ নাই, মজুরি নাই। এছাড়া আছে 'প্রডাকশন'ভিত্তিক মজুরি– যার রেট প্রতি হাজার ফর্মা কাগজ ভাঁজ করা, সেলাই করা, পেস্টিং করা, ম্যাচিং (মিছিল) করার ভিত্তিতে নির্ধারিত। বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই সমিতি ও মহানগরী পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সর্বশেষ ২০১৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৬ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ২৭ টাকা, ৮ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ১৭ টাকা দেওয়া হয়। ম্যাচিং (মিছিল তোলাই) প্রতি হাজারের জন্য ৫ টাকা, পেস্টিং প্রতি হাজারে ২২ টাকা এবং ২ তসমা ২ জুস সেলাই প্রতি শত ৩.৪৫ টাকা প্রদান করা হয়। এর আগে ২০১০ সালের সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ১৬ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ২০ টাকা, ৮ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ১৪ টাকা দেওয়া হয়। ম্যাচিং (মিছিল তোলাই) প্রতি হাজারের জন্য ৩.৭৫ টাকা, পেস্টিং প্রতি হাজারে ২০ টাকা এবং ২ তসমা ২ জুস সেলাই প্রতি শত ২.৭৫ টাকা প্রদান করা হতো। দেখা যাচ্ছে ২০১০ থেকে ২০১৪ সালে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই সামান্য। ২০১৪ সালে নির্ধারিত মজুরি এত কম হওয়ার পরও এবং ২০১৪ সালের পর দ্রব্যমূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ হলেও আজ পর্যন্ত এই বাঁধাই শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এই অতি নিম্নমজুরির কারণে তিন মাস পিক সিজনে ১৩ থেকে ১৬ ঘণ্টা অমানুষিক শ্রম দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক

শ্রমিকদের ৮-১০ হাজার টাকা মেলে কিন্তু সারা বছর এরকম কাজ থাকে না, তখন একজন দক্ষ শ্রমিকের আয় মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা। দৈনিক খাওয়ার খরচের সঙ্গে অন্যান্য খরচ যোগ দিলে কারখানায় সারা বছর বন্দি থেকে বাড়িতে পাঠানোর মতো তেমন কোনো অর্থ থাকে না হাতে। পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত 'বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন' গত ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই ব্যবসায়ী সমিতি বরাবর এক স্মারকলিপিতে এ বিষয়ে লিখেছে– '... সংসার চালানোর জন্য দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হবে কেন শ্রমিককে? অবসর, বিনোদন, পরিবারকে সময় দেওয়ার প্রয়োজন কি শ্রমিকের নেই? বর্তমানে প্রচলিত মজুরির হার গত ২ বছরে বাড়েনি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে, বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি কি অন্যায়?... দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা বাঁধাই শ্রমিকরা সবেতনে সাপ্তাহিক ছুটিও পায় না। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা (অল্প কিছু কারখানায় দুপুর ২টা) পর্যন্ত কাজ করতে হয়। জাতীয় দিবস এমনকি গত ১৬ ডিসেম্বর প্রায় সব কারখানাতে কাজ চলেছে। দুই ঈদে ৭ দিন করে ছুটি, তবে বিনা বেতনে। কোনো উৎসব বোনাস দেওয়া হয় না...।'

বাঁধাই শ্রমিকরা সবাই কারখানাতেই থাকেন। কারখানাতেই খাওয়া, কারখানাতেই ঘুম। বইগুলো একপাশে সরিয়ে ছারপোকায় আক্রান্ত 'বিছানা'য় তাদের শ্রান্তির ঘুম। প্রেস থেকে মাঝরাতে ট্রাকভর্তি ছাপা কাগজ এলে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে মাথায় করে বহনের কাজটাও তাদের। কারখানায় গোসল ও টয়লেটের ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত। বলা হতে পারে, শ্রমিকরা আর যাই হোক বাড়ি ভাড়ার সুবিধাটুকু তো পাচ্ছে! বাস্তবে এই নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকাকে আদৌ কোনো সুবিধা বলা যায় কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। তার চেয়ে বড় কথা, কর্মস্থলে থাকার কথিত সুবিধার বিনিময়ে মালিক আসলে শ্রমিককে যখন তখন বাড়তি খাটিয়ে নেওয়ার সুযোগ কাজে লাগায়, শ্রমিকের শ্রম-সময়ের সর্বোচ্চ সুবিধা মালিক গ্রহণ করে।

বাঁধাই কারখানায় কাগজ কাটার কাজে ব্যবহৃত কাটিং মেশিনগুলো সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হতে থাকা পুরনো ও ত্রুটিপূর্ণ মেশিন। এসব মেশিনে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা প্রায়ই নানান দুর্ঘটনার শিকার হন, কারও কারও এমনকি হাতও কাটা পড়ে। কিন্তু আহত পঙ্গু শ্রমিকরা এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না। একটানা বসে কাজ করতে করতে কোমরে ব্যথা হয়ে যায়, সুইয়ের গুঁতোয় আঙুলে হয় অসংখ্য ছিদ্র। এর জন্য কোনো চিকিৎসা সুবিধা শ্রমিকরা পায় না। বাঁধাই শ্রমিকদের কোনো নিয়োগপত্র নেই, ফলে নিয়োগ-ছাঁটাই সবই মৌখিক ভিত্তিতে হয়। মালিক ইচ্ছামাফিক শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারেন, শ্রমিকরা ছাঁটাই বাবদ কোনো ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারেন না।

নিয়োগপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, চিকিৎসাভাতা, ক্ষতিপূরণ, ন্যূনতম মজুরি, সবেতন সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটি, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস ইত্যাদি সারা দুনিয়ায় শুধু পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদেরই নয়, সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরই অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। অথচ স্বাধীনতার এত বছর পরেও বাংলাদেশের পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকরা এসব ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁধাই শ্রমিকরা সেই ১৯৮১ সাল থেকে এই অধিকারগুলো ভোগ করে আসছে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে, শ্রমিক নিয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে নিয়োগপত্র প্রদান, ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করা শ্রমিকদের প্রতি বছর কাজের জন্য ১০ দিনের সমপরিমাণ বেতন গ্র্যাচুইটি হিসেবে প্রদান, ২০ জনের কম শ্রমিকসম্পন্ন কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকদের ১০ দিন উৎসব ছুটি ও ১৫ দিন বার্ষিক ছুটি এবং ২০ জনের অধিক শ্রমিকসম্পন্ন বড় কারখানায় ১৫ দিন উৎসব ছুটি ও ১৫ দিন বার্ষিক ছুটি প্রদান ও মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয় (সূত্র : অর্গানাইজিং আন-অর্গানাইজড ওয়ার্কার্স : দ্য কেইস অব বাইন্ডারি ওয়ার্কার্স ইন ক্যালকাটা– বিশ্বজিত ঘোষ)। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঁধাই শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাংলাদেশের শ্রমিকদের বর্তমান মজুরির দ্বিগুণেরও বেশি যেমন– পাঞ্জাবে একজন দক্ষ বাঁধাই শ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৩৩১ রুপি (৩৮১ টাকা, প্রতি রুপি সমান ১.১৫ টাকা হিসেবে), বিহারে ৩০৬ রুপি (৩৫২ টাকা), তেলেঙ্গানায় ৩৭৯ রুপি (৪৩৬ টাকা) (সূত্র : http://www.paycheck.in)।

বাংলাদেশের ঘুপচি স্যাঁতসেঁতে আলো-বাতাসহীন কারখানাগুলো যেন এক একটা 'স্যাক্রিফাইস জোন', হয়তো কথিত উন্নয়নের জন্য এরকম অসংখ্য 'সেক্রিফাইস জোন' কায়েম রাখতে হয়! রাষ্ট্রের খাতায় পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের কোনো অস্তিত্ব নেই, মজুরি বোর্ডের ন্যূনতম মজুরি তালিকায় এই শ্রমিকদের নামই নেই! কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্তারাও এসব কারখানায় পা ফেলেন না। সম্প্রতি পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকরা তাদের দৈনিক মজুরি ১৭০ থেকে বাড়িয়ে অন্তত ২৫০ টাকা করার দাবি তুলেছেন। দাবি তুলেছেন সবেতন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির, নিয়োগপত্র, ক্ষতিপূরণের নীতিমালা, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, চিকিৎসা ও বাসস্থানের। ৮ দফা দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সূত্রাপুর শাখার উদ্যোগে গত ৫ জানুয়ারি বাংলাবাজারে তারা বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করেন। এখন পর্যন্ত পুস্তক বাঁধাই মালিক সমিতি কিংবা রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি।

কত রকম বই তৈরি হয় পুস্তক বাঁধাই কারখানায়– টেক্সট বই, গাইড বই, ডায়েরি, গল্প, কবিতা, উপন্যাস। বছরের শুরুতে শিশুদের বই উৎসব কিংবা বইমেলায় নতুন বইয়ের গন্ধ শোঁকা– সবই তাদের এই অমানুষিক সস্তা শ্রমের ফসল। এসব বইয়ে নাকি ভালো ভালো কথাই লেখা থাকে, এই শ্রমিকদের কথা কী সেখানে ঠাঁই পায়! বই নাকি আলোকিত মানুষ তৈরি করে। তাহলে বই বানানোর কারিগরদের জীবনে এত অন্ধকার কেন? বই পড়ে কেমন আলোকিত মানুষ তৈরি হয় যে তারা এসব বইয়ের পেছনের মানুষদের খবরও রাখে না!

লেখক : প্রকৌশলী